শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে মান বৃদ্ধির প্রক্রিয়া জোরদার হচ্ছে

নুরুল ইসলাম নাহিদ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশ কাল
আষাঢ় ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
জুন ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

প্রচ্ছদ ও পরিকল্পনায়
সুবোধ চন্দ্র ঢালী

প্রকাশনায়
টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (টিকিউআই) প্রকল্প
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

প্রাক-কথন

অন্ধকার দূর করে মানবজীবনকে আলোকিত করে শিক্ষা। সে আলোতে উদ্ভাসিত ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র। আমাদের চারপাশে যা কিছু সুন্দর ও কল্যাণকর, যা কিছু মহৎ ও গৌরবের তার প্রধানতম বাহন শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও সমষ্টি চেতনার মিলিত শক্তিতে সমৃদ্ধ জাতি গঠন সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত প্রথাগত শিক্ষা এ উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম নয়। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন করে আধুনিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা।

একটি দক্ষ ও সুশিক্ষিত জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। জাতীয় বাজেটে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। গত দুই বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য ও অর্জন অভূতপূর্ব যা জাতির সৃজনশীলতা ও প্রাণশক্তিতে সঞ্চার করেছে নব উদ্দীপনার।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সাফল্য ও অর্জনের অন্যতম পথিকৃৎ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ। তাঁর নিরলস উদ্যোগ, নিষ্ঠা ও নেতৃত্বে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাধিত হয়েছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। তাঁর সার্বক্ষণিক কর্মপ্রয়াস ও পরিচালনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় গৃহীত কার্যক্রম আজ সর্বমহলে প্রশংসিত। জনমানসে উজ্জ্বল হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি। শিক্ষাকে তিনি নিয়েছেন সামাজিক আন্দোলনের ব্রত হিসেবে। তাঁর শিক্ষা দর্শনের মূলে রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ, দক্ষ ও সুশিক্ষিত জাতি গড়ে তোলা।

ছাত্রজীবন থেকেই আন্দোলন ও সংগ্রামে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন। শিক্ষা সম্পর্কে আছে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা। এই পুস্তিকায় সংকলিত নিবন্ধে তিনি তথ্য, উপাত্ত ও যুক্তি দিয়ে আধুনিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ, সাফল্য ও অর্জন তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর আগামী দিনের অভিপ্রায় ও স্বপ্নের কথা বলেছেন। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের নতুন প্রেক্ষিত, প্রণোদনা ও গতি অনুধাবনে এই পুস্তিকা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও উৎসাহী পাঠকের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে মান বৃদ্ধির প্রক্রিয়া জোরদার হচ্ছে

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। স্বাধীনতার জন্য ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ পঙ্গু হয়েছেন। দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দালালদের হাতে ইজ্জত ও সম্ভ্রম হারিয়েছে অসংখ্য মা-বোন। প্রায় এক কোটি মানুষকে দেশত্যাগ করে শরণার্থী হয়ে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদারদের দোসর ছাড়া এদেশের প্রায় সকল মানুষই কোন না কোন ভাবে নিপীড়ন, নির্যাতন, লুণ্ঠণ ও লাঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন।

আমাদের জাতির স্বপ্ন ছিল দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, পশ্চাদপদতা, সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতিমুক্ত এক উন্নত সমৃদ্ধ সুখী মর্যাদাশীল গণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর অতিক্রম করে এসে সেই স্বপ্ন আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এত বছর ধরে আমরা একটি দুষ্ট চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। এই পরিস্থিতি আর মেনে নেয়া যায় না, চলতে দেয়াও যায় না। জনগণের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি যথেষ্ট হয়েছে এবং জনগণ এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের আকাঙ্খা ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। গত জাতীয় নির্বাচনে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার জনগণের আকাঙ্খা ও প্রত্যাশাকে ধারণ করে, জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন। বর্তমান সরকার একটি **'ডিজিটাল বাংলাদেশ'** অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। দারিদ্র্য, পশ্চাদপদতা, নিরক্ষরতা ও দুর্নীতিমুক্ত একটি উন্নত সমৃদ্ধ সুখী দেশ গড়ার জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে (যখন আমরা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উদযাপন করব) অর্জন করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই লক্ষ্যই-**'ভিশন-২০২১'**।

এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সরকার এবং সমাজের সকল অংশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এ জন্য সকলের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটিয়ে সচেতনভাবে বাস্তব কাজ করতে হবে। গতানুগতিক চিন্তা-চেতনা নিয়ে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি স্বার্থ ও নেতিবাচক চিন্তা পেছনে ফেলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য কাজ করতে হবে। সমষ্টিগত কর্ম প্রয়াসের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির এবং সমাজের প্রকৃত স্বার্থ অর্জন করতে হবে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ', **'ভিশন- ২০২১'** অর্থাৎ দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, পশ্চাদপদতা ও দুর্নীতিমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং আরও সামনে এগিয়ে নেওয়ার প্রধান শক্তি হবে আমাদের নতুন প্রজন্ম। আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে আমাদের নতুন প্রজন্মকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। প্রশ্ন হলো কিভাবে গড়ে তুলবো ?

সকলেই এক বাক্যে এর জবাবে বলবেন- শিক্ষা। নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। একথা শত ভাগ সঠিক। কিন্তু প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষা দিয়ে এই লক্ষ্য অর্থাৎ আধুনিক ডিজিটাল

বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলা যাবে না। আমরা চাই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল মৌলিক পরিবর্তন। আমরা চাই নতুন যুগের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা মানে– জ্ঞান ও দক্ষতা এবং তা হতে হবে জীবন সম্পৃক্ত। যে শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তব জীবনের কাজে লাগে না বা বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না– তা অর্থহীন।

তাই শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি– আধুনিক শিক্ষা, যুগোপযোগী শিক্ষা, মানসম্মত শিক্ষা। আমাদের নতুন প্রজন্ম যাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আয়ত্ত করে তা প্রয়োগ করতে পারে সেই শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রজন্মই আমাদের কাম্য। তবে এটা হলেও তা হবে অসম্পূর্ণ, আমি বলি অর্ধশিক্ষা। আরেকটি জরুরি বিষয় হলো– নতুন প্রজন্মের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ। নতুন প্রজন্মকে সততা, নিষ্ঠা, চরিত্রবান, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং নৈতিক মুল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে নতুন যুগের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই বর্তমান সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জন খুবই কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং কাজ, তা আমি ভালভাবে জানি ও উপলব্ধি করি। কিন্তু আমাদের জাতির স্বপ্ন ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং কাজই করতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পরেই ২০০৯ সালে প্রথম শ্রেণী থেকে নবম-দশম শ্রেণীর ১৯ কোটি পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ নিয়ে যখন আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তাকে অনেকে অবাস্তব পাগলামী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। পরের বার ২৩ কোটি ২২ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কর্মসূচিকেও অনেকে অসম্ভব বলে আমাকে নানা কথা বলেছেন, অনেকে বাধার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমি বলেছি কঠিন চ্যালেঞ্জিং কাজ করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, না হলে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না, আমাদের নতুন প্রজন্ম সাহসী হয়ে উঠবে না। আমরা সকল বই ছাপিয়ে নির্ধারিত দিনে সকল স্কুল, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসায় সকল শিক্ষার্থীর হাতে সুষ্ঠুভাবে পৌছাতে পেরেছি। কাজটা নিঃসন্দেহে অনেক কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং।

আমাদের শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য অর্জন করার জন্য শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, সকল পেশার মানুষ, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, আলেম-ওলামা, প্রধান বিরোধীদলসহ সকল রাজনৈতিক ধারা ও সমাজের সকল অংশের মানুষের মতামত গ্রহণ করে আমরা যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি আমরা যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করব, তা কোনো দলীয় শিক্ষানীতি হবে না, তা হবে জাতীয় শিক্ষানীতি। আজ বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে, জাতির সকল অংশের মানুষের মতামতকে ধারণ করে আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছি। আমরা সকলের সহযোগিতায় তা বাস্তবায়ন করতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

আমরা সকল শিশুকে ২০১১ সালের মধ্যে স্কুলে নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্য অর্জন করতে যাচ্ছি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঝরে পড়া বন্ধ করতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, ৪০% গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান, পঞ্চম শ্রেণী ও অষ্টম শ্রেণীতে জাতীয়ভাবে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করায় শিক্ষার্থীদের সনদ লাভ এবং সারা দেশে একই মান অর্জনের লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা, অন্যান্য সহায়তা প্রদান এবং সার্বিক কার্যক্রম প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হ্রাস করছে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে জাতীয়ভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এই বয়সেই আমাদের শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে।

সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং উদ্যোগে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষণ স্পষ্টই ফুটে উঠছে। আমি বরাবরই বলে আসছি, আজও বলছি, আমাদের সামনে অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে-শিক্ষার মান উন্নয়ন। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য বহু পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। তবে এর ফলাফল দৃশ্যমান করতে সময় লাগবেই। রাতারাতি এক বছরে বা দুই বছরে শিক্ষার মান গুণগতভাবে পরিবর্তন করার কোনো যাদুমন্ত্র নেই। বাস্তব সঠিক কর্মধারার মধ্য দিয়েই আমাদের এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। তবে ইতোমধ্যেই আমরা ফল পেতে শুরু করেছি।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদান করছেন।

দীর্ঘ দিন ধরে শিক্ষা ক্ষেত্রে চলে আসা অনিয়ম, বিশৃংখলা, দুর্নীতি, জঞ্জাল পরিষ্কার করতে আমরা শুরু থেকে কঠিন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। এ সকল সংকটের শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরে আসছে, দুর্নীতি কমে আসছে। এ বিষয়ে টিআইবি এর রিপোর্টে তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি ২৯% থেকে কমে ১৫% নেমে এসেছে। অনিয়ম দুর্নীতি বিশৃংখলার বিরুদ্ধে আমাদের প্রচেষ্টাকে সকলেই সহযোগিতা করবেন এই আহবান জানাচ্ছি। আমি দায়িত্ব নিয়ে প্রথম দিনেই বলেছি, আমরা চাই– স্বচ্ছ, দক্ষ, গতিশীল এবং দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা প্রশাসন। আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই (Good Governance in Education)। এ সকল বিষয়ে আমি শুরু থেকেই দৃঢ় অবস্থান নিয়ে কাজ করছি। তবে এই কাজটি যে কঠিন তা বলতে আমার দ্বিধা নেই। দুর্নীতির সঠিক তথ্য প্রমাণ আমার হাতে দেয়ার জন্য আমি বার বার সকলের সাহায্য চেয়েছি।

প্রথম থেকেই আমি বলেছিলাম– আমরা শিক্ষা পরিবার একই লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করবো, যাতে আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়। আমার সকল সহকর্মী তথা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থা প্রধানদের নিয়ে একটি টিম গড়ে তোলা ও তার মাধ্যমে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি সবাইকে বলেছি আমরা টিম হিসেবে এক সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করব। একসাথে সফল হব, ব্যর্থতার দায়ও নেব। কিন্তু প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে তা অবশ্যই পালন করতে হবে। এজন্য সব সময় সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। আমার কাজের জন্য যথাস্থানে আমিও জবাবদিহি করব।

সকলেই জানেন স্কুলগুলোতে প্রতি বছর ক্লাশ শুরু করতেই মার্চ-এপ্রিল হয়ে যেতো। যথাসময়ে বই কেনার সমস্যা ছিল প্রকট। নোট বা গাইড বই কিনতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হতো। আমরা এখন স্কুলে ১ জানুয়ারি ক্লাশ শুরু করছি, এতে সময় বাঁচছে, বেশী ক্লাশ নেয়া সম্ভব হচ্ছে।

এসএসসি পরীক্ষা হতো এপ্রিল-মে মাসে। এইচএসসি তারও পরে। ফলাফল প্রকাশ হতো ৩ মাস বা সাড়ে ৩ মাস পর। আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করে তা এগিয়ে আনতে পেরেছি। এ বছর এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে ১ ফেব্রুয়ারি। আমরা দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই এসএসসি ও এইচএসসি ফল প্রকাশ করা হচ্ছে পরীক্ষা সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে। এমন কি দু'বার তারও কম সময়ে ফল প্রকাশ হয়েছে। এতে অনেক সময় বেঁচে যাচ্ছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বের তুলনায় অনেক আগেই ক্লাশ শুরু হচ্ছে।

প্রথমবার থেকেই পরীক্ষার্থীদের ফলাফল ওয়েবসাইটে, ই-মেইলে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে মোবাইল ফোনে এসএমএস করে কয়েক সেকেন্ডেই ফলাফল জানতে পারছে। গত দু'টি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু'টি করে জেলায় টেলি-কনফারেন্সের মাধ্যমে শিক্ষক ও পরীক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেছেন। এভাবে আমরা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সকল ক্ষেত্রে প্রসারিত করছি। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। অনলাইনে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন ভর্তি করা হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রবেশপত্র পর্যন্ত অনলাইনে দেয়া হয়েছে। কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

যে সকল পশ্চাদপদ ও দুর্গম অঞ্চলে কম্পিউটার নেই সেখানে ভ্রাম্যমাণ আইটি ল্যাব পাঠানো হচ্ছে। প্রায় এক বছর পূর্বে ১৪ টি মাইক্রোবাস ও ৩ টি জিপে কম্পিউটার সেট করা হয়েছে যা বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে স্কুলগুলোতে যাচ্ছে। প্রতিটি ভ্রাম্যমান কম্পিউটার ল্যাবে ৫টি ল্যাপটপ, ৫টি ইন্টারনেট মডেম, ২টি ডিজিটাল ক্যামেরা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ওয়েবক্যাম, মাল্টি ফাংশনাল প্রিন্টার, পেনড্রাইভ, ইন্টারএ্যাকটিভ বোর্ড, সিডি, স্পিকার, হেডফোন ও জেনারেটর রয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। এ জন্য আমরা উদ্বিগ্ন। তাই শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আকৃষ্ট করার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে বিজ্ঞানের ক্লাশকে আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করার চেষ্টা করছি। একটি মোবাইল বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি তৈরী করে বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। আমরা ২০,৫০০ স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এনসিটিবি'র পাঠ্যপুস্তক ই-বুকে রূপান্তর করা হয়েছে। সকল পাঠ্যপুস্তক ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে। ৭০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,৪১৪ টি ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০টি বিদ্যালয়ে পাইলটিং এর জন্য আধুনিক কম্পিউটার ল্যাপ স্থাপন করা হয়েছে।

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুবিধ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এর মধ্যে আর একটি নতুন উদ্যোগ হলো দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শ্রেণী পাঠদান সারা দেশের স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য শোনা ও দেখার ব্যবস্থা গ্রহণ। ভাল শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান বিটিভির মাধ্যমে প্রচার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রত্যেক স্কুলে টেলিভিশনের ব্যবস্থা করা হবে। ১৪ জুন থেকে তা প্রচার শুরু হয়েছে। প্রথমে নবম শ্রেণীর ইংরেজি, গণিত, রসায়ন, তিনটি বিষয়ে রবি, সোম, মঙ্গলবার, সকাল ৯ টা ১০ মিঃ থেকে ১০ টা পর্যন্ত প্রচার করা হচ্ছে। পরবর্তীতে অন্যান্য ক্লাশ ও বিষয় যুক্ত করা হবে। ভবিষ্যতে সরাসরি প্রচারের ব্যবস্থা হবে। এতে শিক্ষার্থীরা দেশের সেরা শিক্ষকদের ক্লাশ করার সুযোগ পাবেন। শিক্ষকরাও অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ও সময়োপযোগী কারিকুলাম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক তৈরী করা হচ্ছে। মুখস্ত ও নোট-গাইড বই ভিত্তিক শিক্ষার পরিবর্তে মূল পাঠ্যবই পড়া এবং যা পড়ানো হবে তা শিখতে হবে। সে জন্য পাঠদান পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য আনা হচ্ছে। শেখা হয়েছে কিনা তা যাচাই করার

জন্য পরীক্ষা বা মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এখন সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা শিখে পরীক্ষা দিচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার মানও বাড়ছে, ফলাফলও ভাল করছে।

দীর্ঘদিন থেকে আমাদের শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেয়া পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস ও তথ্য বিকৃতি আমরা দায়িত্ব নেয়ার পর সংশোধন করে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতির অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস ও তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়। আমরা অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ১০ এপ্রিল জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযোজন করেছি।

নতুন প্রজন্মকে জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে জাতির বিভিন্ন সংগ্রাম ও বিজয়ের দিবসগুলো সরকারি ছুটির দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাশ বন্ধ রেখে যথাযোগ্য কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়। এখন প্রতি বছর ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৫ আগস্ট, ১৭ এপ্রিল প্রভৃতি দিবস পালিত হচ্ছে। জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য বীরত্বগাঁথা আমাদের নতুন প্রজন্মকে গৌরববোধ করতে এবং সাহসি করে তুলবে।

৩০ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ উদ্বোধন করছেন।

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সব থেকে বড় শক্তি, আমি বলি নিয়ামক শক্তি হচ্ছে 'শিক্ষক'। শিক্ষকদের অনেক সমস্যা আছে তা আমার ভালোভাবেই জানা আছে। আমাদের শিক্ষকদের আর্থিক সমর্থন ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আমরা কাজ করছি। এ বছর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনও সমানভাবে বৃদ্ধি করেছি। মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদার বৈষম্য দূর করা হয়েছে। মেধাবীদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন উপায় খোঁজা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আমরা শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন স্কেলের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছি। আমাদের জাতির পক্ষ থেকে সব কিছু নিয়ে আমরা শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াবো। কিন্তু আমাদের শিক্ষকদের ত্যাগের মনোভাব নিয়ে নিবেদিত প্রাণ হয়ে শিক্ষার্থীদের আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের ১৪ টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে নিয়মিত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক তৈরী করা হচ্ছে। বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষক তৈরী করা হচ্ছে। তাদের গুণগত মান যাতে উন্নত হয় এবং নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন আমরা সেদিকে জোর দিচ্ছি।

আমরা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠদান ও শিক্ষক হিসেবে উন্নত মান অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। বিদেশ থেকেও আমরা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আনছি। প্রশিক্ষণের ফলে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে "টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (টিকিউআই) প্রকল্প" এর আওতায় এ পর্যন্ত ১,৯৮,০০০ জন শ্রেণী শিক্ষক, ১৬,৫০০ জন প্রধান শিক্ষক, ৪৫,০০০ জন স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং ১,১০০ জন শিক্ষা কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত শিক্ষকগণের মধ্যে ১,১৩,০০০ জনকে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ এবং ৪০,০০০ জনকে তৃতীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ ছাড়াও এ প্রকল্প ৪৮০ জন শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাকে ১ মাস থেকে ২ বছর ব্যাপী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এদের মধ্যে ২৮ জন স্কুল শিক্ষক। Connecting Classroom প্রকল্পের আওতায় ১০০ প্রধান শিক্ষক ও ১০০ শ্রেণী শিক্ষক যুক্তরাজ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ভাল ফলাফল করেছে ঢাকা শহরের এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২২ জন শিক্ষক রয়েছেন। টিকিউআই প্রকল্পের আওতায় ১৪টি টিটিসি, ৫টি এইচএসটিটিআই এবং ১টি বিএমটিটিআই-এ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ১২৮টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন স্থাপন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি)' আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য 'সৃজনশীল' প্রশ্ন পদ্ধতি বিষয়ক ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২,৮৪, ৫৮৭ শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এপ্রিল-জুন ২০১১ সালের মধ্যে আরও ৯০,০০০ শিক্ষকের ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। 'এসইএসডিপি' এর আওতায় ঢাকা শহরের ১৭ টি সেরা বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ১৯২ জন। এ প্রকল্পের আওতায় ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩৫ টি মাদ্রাসায় আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

আমাদের আরেকটি প্রকল্পের নাম- 'সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)'। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা হলো এর প্রধান কাজ। দেশের পশ্চাদপদ অঞ্চল বিশেষ করে হাওর, বাওর, চর, উপকূল প্রভৃতি অঞ্চলের পশ্চাদপদ মোট ৬,৮০৮টি হাই স্কুল ও মাদ্রাসা বাছাই করে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন ধরে রাখা এবং মান বৃদ্ধির জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

এসব স্কুলের শিক্ষার মান খুবই নিম্ন এবং এসএসসি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় ইংরেজি ও গণিতে পাশ করা শিক্ষার্থীর হার ও সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাই এসকল প্রতিষ্ঠানে ২৬০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষক (Master Trainer) প্রেরণ করে শিক্ষকদের সমস্যাগুলো উপলব্ধি করে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ পর্যন্ত এ সকল প্রতিষ্ঠানের মোট ৫৭,১৩৬ জন শিক্ষককে দুই পর্যায়ে অর্থাৎ ১২ দিন ও ৬ দিন করে প্রত্যেককে মোট ১৮ দিন ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। এই শিক্ষকরা ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাশ নেন যাতে শিক্ষার্থীরা এ দু' বিষয়ে ভাল করতে পারে। ইংরেজি বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাশ নেয়া হয়েছে ৬,৫৯,৯২৫ টি, এ জন্য ব্যয় হয়েছে ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। গণিত বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাশ নেয়া হয়েছে ৬,৫৭,২২৫ টি, এ জন্য ব্যয় হয়েছে-৭ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া বন্ধ করা এবং লেখা পড়ায় উৎসাহিত করার জন্য এ প্রকল্প থেকে – ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাসিক ১২০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত উপবৃত্তি দেয়া হয়। এ পর্যন্ত ২৪,৩৩,৩০৪ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে মোট ২৯২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

তাছাড়া প্রত্যেক স্কুলে ভাল শিক্ষক, প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীসহ ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দেয়া হয়। এ পর্যন্ত প্রদেয় মোট পুরস্কারের সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৯৬ টি। এ জন্য ৪২ কোটি ৪৪ লক্ষ, ৫১ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে।

পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করা, লেট্রিন নির্মাণ, পরিচালনা কমিটির সদস্যদের ট্রেনিংসহ বহু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে পশ্চাদপদ অঞ্চলে ঝরে পড়া কমেছে, ইংরেজি ও গণিতে ফেল করার সংখ্যা ও হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, সাধারণভাবে শিক্ষার মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বিক প্রচেষ্টার ফলে সারা দেশে গণিত ও ইংরেজীতে অতীতে যেখানে অর্ধেক পরীক্ষার্থী ফেল করতো, বর্তমানে এ সকল উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে সার্বিকভাবে এসএসসি পরীক্ষায় শতকরা ৮০ জনের বেশী পরীক্ষার্থী পাশ করছে।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর
আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাম্পাস উদ্বোধন করেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা
১৩ই পৌষ-১৪১৭ বঃ, ২০শে মহররম-১৪৩২ হিঃ, ২৭শে ডিসেম্বর-২০১০ খ্রিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন শেষে মোনাজাত করছেন।

আমরা দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে শিক্ষকদের অবসর ভাতা ও কল্যাণ ভাতা যথাসম্ভব দ্রুত তাদের হাতে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অতীতে দুর্নীতির রাজত্বে ঘুষ দিয়েও শিক্ষকদের অবসর ভাতা ও কল্যাণ ভাতা হাতে পেতে বছরের পর বছর ঘুরতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের সময় তা হবে না। শিক্ষকদের চেকের পেছনে ঘুরতে হবে না, চেক শিক্ষকদের পেছনে ছুটবে। শিক্ষকরা বর্তমানে এর প্রমাণ পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় ১৬ হাজার শিক্ষককে ১ শত ৬৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অবসর সুবিধা বোর্ডের আওতায় ১৮ হাজার ২৫ জন শিক্ষক/কর্মচারীকে ৪ শত ৫৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ২১৩ টাকা প্রদান করা হয়েছে। কোনো ধরনের ভোগান্তি ছাড়াই শিক্ষকরা এ টাকা

পেয়েছেন। অনেক অসুস্থ শিক্ষককে বাড়িতে চেক পৌঁছে দেয়া হয়েছে। হজ্ব যাত্রী ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ ব্যবস্থায় দ্রুত চেক প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের 'জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী'–নায়েমের মাধ্যমে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা দায়িত্ব নিয়েই দেখলাম সরকারি কলেজের বিসিএস ক্যাডারের শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ বা ফাউন্ডেশন ট্রেনিং যা চাকুরি জীবনের শুরুতেই হওয়ার কথা, তা চার/পাঁচ বছর চাকুরি করার পরও হয়নি। তাই আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে জমে থাকা ২৬২২ জন শিক্ষকের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছি এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্তদের চাকুরীতে নিয়োগ পাওয়ার সাথে সাথেই ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। অধ্যক্ষ ও সিনিয়র অধ্যাপক এবং আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক পৃথক শিক্ষক এবং জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) থেকে আড়াই বছরে মোট ১০,০৫৫ জনকে ২ সপ্তাহ থেকে ৪ মাস পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

আমরা উচ্চ শিক্ষাকে বিশ্বমানে পৌঁছাতে চাই। এজন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, নতুন জ্ঞান অনুসন্ধানসহ মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি এখন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে এবং সরাসরি মন্ত্রণালয় থেকে গবেষণার জন্য অর্থ অনুদান দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষা খাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা প্রকল্পের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে গবেষণা অর্থ সহায়তা বাবদ ১৯ গবেষককে ১ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৩৭ জন গবেষককে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। মোট ৫৬ জন গবেষককে গবেষণার জন্য ২ বছরে ৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে।

হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় ৬৮১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সকল উপযুক্ত পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচিং-লার্নিংএর গুণগত মান বৃদ্ধিকরণ এবং উদ্ভাবনী বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে উচ্চতর গবেষণার জন্য পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের ৩৯ টি প্রকল্পে ৫,৬০,৩০,১০০ টাকা দেয়া হয়েছে। এ সকল উদ্যোগ প্রমাণ করে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞান চর্চা, গবেষণা, নতুন জ্ঞান অনুসন্ধানের ওপর বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

আমরা কয়েক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার দিতে পেরেছি। কিছু প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। সেজন্য আমরা ভ্রাম্যমান আইসিটি ল্যাব চালু করেছি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা লাইব্রেরি গড়ে তোলা বা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ঐতিহ্য ও চেতনায় শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তনসহ বহু কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। আমরা হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ও হাক্কানী পাবলিশার্স কর্তৃক মুদ্রিত ১৫,০০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ১৫ খণ্ডের একটি করে সেট এ বছরই (২০১১ সালে) ১৬,৬৬৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দিয়েছি। গত ২০০৯ সালে ৬৭৩ সেট ও ২০১০ সালে ২৬৬ সেট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেয়া হয়েছে।

আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা লাইব্রেরিয়ান পদে নিয়োগ দিতে পারছি না। আমরা আশা করছি যে কোনো একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো লাইব্রেরি ও তা ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আমাদের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। এজন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং তার ফলও পাওয়া যাচ্ছে। শুধুমাত্র টেক্সটাইল সেক্টরে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত দক্ষ লোকের অভাবে আমাদের দেশে প্রায় ২০ হাজার বিদেশী চাকুরী করছেন, অথচ আমাদের দেশের মানুষ দক্ষতার অভাবে দেশের মধ্যেই চাকুরী পাচ্ছেন না। তাই আমরা টেক্সটাইল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেছি। লেদার টেকনোলজি কলেজকে উন্নত মানের দক্ষ জনবল গড়ার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইন্সটিটিউটে পরিণত করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা
Inauguration of
Bangladesh University of Tex
by
Sheikh Hasina

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৫ মার্চ ২০১১ তারিখে তেজগাঁওয়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন শেষে মোনাজাত করছেন।

কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কার জরুরী। আমাদের দেশের কারিগরি শিক্ষাকে আমরা মানসম্মত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা সময়োপযোগী সিলেবাস তৈরী করতে চাই। সেজন্য বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা যায় এবং চাকুরি লাভ, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ও সক্ষম সিলেবাস ও পাঠ্যক্রম এবং হাতে কলমে শিক্ষা দিতে চাই। সেজন্য দেশে বিদেশে বিনিয়োগকারিদের নিকট থেকে আমরা জানার চেষ্টা করছি কি ধরনের দক্ষ কর্মী তাদের প্রয়োজন, তারা আগামীতে কি প্রযুক্তি ব্যবহার করবেন। এভাবে বাস্তব চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে আমাদের টেকনিক্যাল শিক্ষার্থীদের জন্য কারিকুলাম তৈরী করার কাজ শুরু করেছি।

মানসম্মত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান এবং পাঠদানের মান উন্নয়নের জন্য বিদেশ থেকে আমরা বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এনেছি। দেশেও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছি।

কারিগরি শিক্ষায় সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। সেই সংগে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও হাতে কলমে শিক্ষা লাভের লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংশ্লিষ্ট কারখানার

সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারখানা উভয়ে মিলে সম্পর্ক সৃষ্টি ও কার্যক্রম চালাতে হবে।

আমাদের জাতির সামনে অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হচ্ছে- মানবসম্পদ উন্নয়ন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার আমাদের জন্য একটি প্রধান কর্তব্য।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য, আকর্ষণীয় ও মর্যাদাশীল করার লক্ষ্যে এবং এর সমস্যা, সমাধান ও করণীয় চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে আমরা জুন- ২০১০ সালে 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ' নানা ধরণের কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করেছি। এতে আমরা ব্যাপক সাড়া ও ফল পেয়েছি এবং পাচ্ছি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। বিগত জোট সরকারের সময় প্রকৃতই এই প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতি, অনিয়ম ও বিশৃংখলার দূর্গ হয়ে উঠেছিল। আমরা বিগত আড়াই বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্নীতি মুক্ত করে নিয়ম শৃংখলার মধ্যে নিয়ে আসা এবং এখানে কাজের জন্য যারা আসেন-শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষ তাদের দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। একে জঞ্জালমুক্ত করে এক স্বচ্ছ, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত গতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যকর করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অনেক উন্নতি হয়েছে। শতভাগ সফল এখনও হতে পারিনি। তবে তা অর্জন করতে আমরা বদ্ধপরিকর। আরও দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার পর এবারই প্রথম বারের মত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। 'মাউশি'র উদ্যোগে উপজেলা, জেলাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম এবং উদ্যোগ সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের একটি সাধারণ ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিয়মিত কাজ ছাড়াও ৭৯ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এবারের এসএসসি পরীক্ষা এবং এর ফলাফল সম্পর্কে কিছু কথা বলা যায়। সময় এগিয়ে এনে এবার ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু করে সময়মত শেষ করে যথারীতি ৬০ দিনের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এবারের এসএসসি'র ফলাফল সর্বকালের মধ্যে পরীক্ষার্থীরা সেরা ফল করেছে। এবার সাধারণ ৮টি বোর্ড এবং মাদ্রাসা ও টেকনিক্যালসহ মোট ১০ টি শিক্ষাবোর্ড থেকে মোট ১৩,০৭, ১৫৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে মোট ১০,৭৫,৮৮৬ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। শতকরা পাশের হার হচ্ছে ৮২.৩১%। জিপিএ ৫ পেয়েছে ৭৬,৭৪৯ জন। গতবারের তুলনায় এবার ১,১৫,৩৯৪ জন বেশী পাশ করেছে। গত বছর পাশের শতকরা হার ছিল ৭৯.৯৮%। এবার বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৩৩%। শতভাগ পাশ করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হচ্ছে- ২০১৭ টি। শূন্য পাশ করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৮টি, গতবার ছিল ৪৯ টি, কমেছে ২১ টি। ২৮টির মধ্যে স্কুল মাত্র ১টি (বরিশাল বোর্ড), মাদ্রাসা ২২টি, টেকনিক্যাল ৫টি। স্কুলের উন্নতি ভাল হয়েছে। পাশের হার এবার ৮২.১৬% গত বছর ছিল ৭৮.১৯%। গত বছরের তুলনায় পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৯৭% ।

ফলাফলের আরেকটি দিক দেখা যেতে পারে। ৮টি সাধারণ বোর্ড থেকে ১৫,৪৪৯ টি স্কুল পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৫০% থেকে ১০০% পরীক্ষার্থী পাশ করেছে ১৪,৮৮৪ টি স্কুল থেকে। মাদ্রাসা কারিগরিসহ ১০টি বোর্ডের ২৬,২২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল, এর মধ্যে ৫০% থেকে ১০০% পাশ করেছে ২৫,০২৮ টি প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থী। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় গ্রামাঞ্চলসহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হয়েছে। শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফলাফল ভাল হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের কয়েকটি স্কুলের উদাহরণ নিচে দেয়া হলো।

সারা দেশে শুধু শহরে নয় গ্রামেও যে শিক্ষার মান ও ফলাফলে উন্নতি হয়েছে তার প্রমাণ মিলবে শহর থেকে দূরের কয়েকটি স্কুলের উদাহরণ থেকে। যেমন ঢাকা বোর্ডের রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দির নবাবপুর হাই স্কুল থেকে ২০১০ সালে পাশের হার ছিল ৩২.৩১%, এবছর ২০১১ সালে সেখানে পাশের হার ৪৬.৩৬% বেড়ে হয়েছে ৭৮.৬৭%। জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার পিংনা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গত বছর ৩৮.৬৯ পাশ করেছিল, এ বছর পাশ করেছে ৮২.৬৬%, বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৩.৯৭%। নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার ভুগি জোয়ানি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গত বছর পাশ করেছিল ৫০%, এ বছর পাশ করেছে ৯১.৬৭%, বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১.৬৭%। গোপালগঞ্জ জেলার বোলতলি সাহাপুর সম্মিলনি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গত বছর পাশ করেছিল ৫০.৭২%, এ বছর পাশ করেছে ৮৯.৬৬%, বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৮.৯৪ %।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার মির্জাকালু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গত বছর পাশ করেছিল ৩৩.৩৩% এ বছর পাশ করেছে ১০০%, বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৬.৬৭%। বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার সফরুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গত বছর পাশ করেছিল ৪৮.৭২% এ বছরে পাশ করেছে ১০০%, বৃদ্ধি পেয়েছে ৫১.২৮%।

একটি অনুষ্ঠানের ফাঁকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ করছেন।

চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে সন্দীপ এর সমেষপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গত বছর পাশ করেছিল ৪০.৯৮%, এ বছর পাশ করেছে ৯৪.৫৯%, বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৩.৬১%। মিরসরাই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গত বছর পাশ করেছিল ৪৫.৬৫ % এ বছর পাশ করেছে, ৯৭.৬২%, বৃদ্ধি পেয়েছে ৫১.৯৭%। সিংগরা রাম কানাই উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গত বছর পাশ করেছিল ৩৩.৩৩%, এ বছর পাশ করেছে ৮৩.৩৩%, বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০%। এ তালিকা অনেক দীর্ঘ করা যায়। তবে তা না বাড়িয়ে উদাহরণ হিসেবে এগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় আমাদের নানা উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা দূরের গ্রামাঞ্চলেও অবহেলিত স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও ফলাফলে উন্নতি হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সিলেট বিভাগ অনেক পিছিয়ে আছে। তাই সিলেটের উদাহরণ দেয়া যায়। অঞ্চল হিসেবে আপাতঃ দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে তুলনামূলকভাবে সিলেট বিভাগ কিছু এগিয়ে থাকলেও শিক্ষায় সিলেট বিভাগ সকলের চেয়ে পেছনে। সিলেটে এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, পাশের হার সবই ছিল হতাশাজনক। প্রাথমিক, মাধমিক, কলেজ এর সংখ্যা ও শিক্ষার মান এবং সফলতা সকল ক্ষেত্রেই সারা দেশের তুলনায় সব দিক থেকে শিক্ষায় পিছিয়ে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক কম। গত দু' বছরে বিশেষ উদ্যোগ ও চেষ্টার ফলে অনেক

পরিবর্তন এসেছে সার্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। এসএসসি পরীক্ষা থেকে সিলেট বিভাগের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে উন্নতির ধারা সূচিত হয়েছে তার এক পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়।

সিলেট শিক্ষা বোর্ড থেকে ২০০৭ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩২,৪৯২ জন, পাশ করেছিল ১৫,২৭০ জন, পাশের হার ছিল ৪৭,২৭%। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা-৪৮,৪৭৮ জন, পাশ করেছে ৩৯,৩৭৮ জন, ২০০৭ সালের চেয়ে ২৪,১০৮ জন পরীক্ষার্থী বেশী পাশ করেছেন। সিলেট বিভাগে অর্থাৎ সিলেট শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৭২৭ টি স্কুলের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ৭১১টি স্কুলের পরীক্ষার্থী ৫০% থেকে ১০০% পাশ করেছে। মাত্র ১৬টি স্কুলের শিক্ষার্থী ৫০% এর কম পাশ করেছে।

স্কুলগুলোর শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে টিকিউআই প্রজেক্টের আওতায় সিলেট বিভাগে ১০,০৮৫ জন শিক্ষক এবং সিলেট জেলায় ৪,৯৯১ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসইএসডিপি প্রকল্পের আওতায় সিলেট বিভাগে ৫০৭৭ জন এবং সিলেট জেলায় ১,৮৫৯ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সিলেট বিভাগে ৫৭ জন এবং সিলেট জেলায় ২৫ জন শিক্ষককে।

সিলেট জেলায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া হ্রাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে গত দু' বছরে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। ২০১০ সালে আমরা সিলেট বিভাগে প্রাথমিক স্তরে বিনামূলে বই বিতরণ করেছিলাম-৬৫,৯৬,৪০৮ টি। এ বছর বই দেয়া হয়েছে ৭৪,৭১,৩৫২ টি, বৃদ্ধি পেয়েছে ৮,৭৪,৯৪৪ টি বই এবং বৃদ্ধির হার হচ্ছে ১৩%। ২০১১ সালে মাধ্যমিকে বই দেয়া হয়েছে-৪৮,৬৬,৫১৮ টি, ২০১১ সালে দেয়া হয়েছে-৬৩,০২,৯৬৪ টি বই, বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪,৩৬,৪৪৬ টি বই এবং বৃদ্ধির হার হচ্ছে ২৯.৫১%।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল ছাত্রসমাবেশে তৎকালীন ছাত্রনেতা নুরুল ইসলাম নাহিদ।

২০১০ সাল থেকে ২০১১ সালে সারাদেশে মাধ্যমিকে পাঠ্যপুস্তক বৃদ্ধির হার হচ্ছে ২২.২১%, কিন্তু সিলেটে বৃদ্ধির হার হচ্ছে ২৯.৫১%। অর্থাৎ মাধ্যমিকে জাতীয় গড় বৃদ্ধির হারের চেয়ে সিলেটে বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৩০%। শিক্ষার সকল সূচকে সিলেট বিভাগ পিছিয়ে থাকলেও গত দু' বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে।

দেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলে প্রাপ্যতার চেয়ে অনেক বেশী এমনকি অনেক অঞ্চলে প্রাপ্যতার চেয়ে ৩/4 গুণ বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও সারা দেশে নিয়মিত বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলেও শিক্ষায় পশ্চাদপদ এবং প্রাপ্যতার চেয়ে কম সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও সিলেট বিভাগে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংখ্যা খুবই কম। বিগত দু' বছরে ব্যাপক প্রচেষ্টার ফলে নতুন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে ১৫ টি এবং স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে ১৬টি। মাধ্যমিক

বিদ্যালয় পাঠদানের অনুমতি ৪৪টি এবং স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে ৬৩ টি। ৩১ ও ৫টি কলেজ যথাক্রমে অনুমতি ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া সিলেট বিভাগকে জাতীয়ভাবে সমপর্যায়ে পৌছাতে অনেক নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, হাওর অঞ্চল, সাবেক মঙ্গাপীড়িত অঞ্চল, চরাঞ্চলসহ শিক্ষায় পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। সকল অঞ্চলেই উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম বিভাগের প্রাপ্যতার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম রয়েছে। ঢাকা বিভাগেও কিছু কম রয়েছে। তবে এ দু' বিভাগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক। সিলেট বিভাগ শিক্ষায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার হিসাবে অনেক বেশি পিছিয়ে আছে। এজন্য সিলেটের উদাহরণ বিস্তারিত দেয়া হলো।

গ্রামাঞ্চলের স্কুল এবং শিক্ষায় দেশের পশ্চাদপদ অঞ্চলের ফলাফলে উন্নতি প্রমাণ করে সার্বিকভাবে শহর গ্রাম নির্বিশেষে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি হচ্ছে। এ ছাড়া আমরা বহু বিষয়ে নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছি। সব কিছু এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়ার জন্য কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে জনপ্রিয় করা এবং শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য ২০১০ সালের জুন মাসে প্রথম বারের মতো "কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষা সপ্তাহ" পালন করে ব্যাপক প্রচার, সেমিনার, আলোচনা সভা, সমস্যা ও সমাধান চিহ্নিত করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে ফল পেতে শুরু করেছি।

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতিতে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ও করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে উন্নত ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। ইসলামী শিক্ষার জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। মাদ্রাসার শিক্ষক ও অধ্যক্ষের বেতন ও মর্যাদা স্কুল/কলেজের সাথে অতীতের বৈষম্যের অবসান করে সমবেতন ও সমমর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে।

মাদ্রাসায় অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১ হাজার মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদন করে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ৩৫ টি মাদ্রাসাকে মডেল মাদ্রাসায় উন্নীত করা হয়েছে। কম্পিউটার ল্যাবসহ উন্নত ভবন ও শিক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ১০০টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে।

৩১ টি মাদ্রাসার বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ চলছে এবং তা আরও বৃদ্ধি করা হবে। স্কুলেও প্রাথমিক পর্যায় থেকে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণীর পর জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (স্কুলের ন্যায় সমমানের) চালু করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। আলেম সমাজের ৭৫ বছরের দাবি অনুসারে একটি ইসলামী এরাবিক এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কওমী মাদ্রাসা যারা পরিচালনা করেন তাদের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি কওমী মাদ্রাসা সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য শিক্ষানীতিতে ঘোষণা করা হয়েছে। সরকার কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সুপারিশ অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ছাত্রীদের উপর বখাটে-সন্ত্রাসীদের আক্রমণ ও তাদের উত্যক্ত করা ও চাপ সৃষ্টির বিরুদ্ধে ছাত্রী ও মা-বোনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রয়োগের পাশাপাশি আমরা সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি।

শিক্ষার্থীরা যাতে মাদকাশক্ত না হয় সেজন্য আমরা ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছি। জঙ্গিবাদের সাথে যাতে শিক্ষার্থীরা কোনভাবে জড়িয়ে না পড়ে সে কথা বিবেচনায় রেখে আমরা

এ সরকারের সময়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন এসেছে। বিগত দিনের ঘুষ-দুর্নীতি, হয়রাণি ও ফাইলের পাহাড় পেরিয়ে 'চেকের পেছনে শিক্ষক-কর্মচারী নয়, শিক্ষক-কর্মচারীর পেছনে চেক ছুটবে' নীতি চালু করা হয়েছে। ছবিতে একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রবীন ও অসুস্থ শিক্ষকের চেক প্রদান শেষে মন্ত্রী গভীর শ্রদ্ধা ও মমতায় তাঁকে বুকে জড়িয়ে নেন।

সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০০০ হাই স্কুল ১০০০ মাদ্রাসা ১৫০০ কলেজ, ৭০টি বড় কলেজ, ৩০৬ টি মডেল স্কুল, ৩৫ টি মডেল মাদ্রাসা প্রভৃতি সর্বমোট প্রায় ৬ হাজার ভবন নির্মাণের কাজ চলছে বা প্রক্রিয়াধীন আছে। ঢাকা মহানগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নতুন এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠার কথা বিবেচনা করে সরকারি উদ্যোগে ঢাকা মহানগরে ১১টি হাই স্কুল এবং ৬টি সরকারি কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে।

এই প্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকৌশল বিভাগের দীর্ঘ দিনের জটিলতা ও স্থবিরতা কাটিয়ে উঠার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করেছি। জনবল বৃদ্ধি এবং প্রমোশন প্রদান করা হয়েছে। সকল জেলায় এর দপ্তর ও জনবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই বিভাগের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে। আমরা এ জন্য কঠোর অবস্থান নিয়েছি। এই প্রতিষ্ঠানকে আরও স্বচ্ছ, দক্ষ, গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কাজটি বেশ কঠিন সে সম্পর্কে আমি সচেতন।

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের জাতীয় দিবসগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য সংগ্রাম বিজয় প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত করা ও আমাদের ইতিহাসের উপাদান থেকে জাতীয় গৌরবে উজ্জীবিত এবং সাহসী করে তোলার লক্ষ্যে নানা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

সকল শিক্ষা বোর্ডের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রতি বছর শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করা হচ্ছে যাতে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হতে পারে। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও উৎসাহিত করা হচ্ছে। সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা, পাঠদান, শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ, নারীর নিরাপত্তা ও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী এবং মাদক ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে থাকার জন্য সচেতন করা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষকদের 'টিচার্স গাইড' তৈরী করে দেয়া হচ্ছে।

আমি বুঝতে পারছি- আমার লেখা দীর্ঘ হয়ে গেছে। পাঠকরা বিরক্ত হবেন, তাই এর কলেবর বৃদ্ধি না করে শুধু একটি কথা বলে শেষ করতে চাই। তা হলো- শিক্ষা আমাদের অন্যতম প্রধান জাতীয়

অগ্রাধিকার। শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা এবং উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যে কঠিন কাজ তা সকলেই স্বীকার করবেন। আর্থিক ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা তো রয়েছেই। জাতীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে জরুরি চাহিদার চেয়েও অনেক কম বরাদ্দ দেয়া হয়। তাই আমি শুরু থেকেই আমার সকল সহকর্মীকে যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে বলে আসছি তা হলো- সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আমাদের মনোভাব হবে এক টাকা দিয়ে দুই টাকার কাজ করা। দুর্নীতি বন্ধ করে টাকা বাঁচিয়ে কাজে লাগাতে হবে। অপচয় করা চলবে না। জনগণের অর্থ অপচয় বা অবহেলায় নষ্ট করাও অপরাধ।

শিক্ষা খাতে যে পরিমান অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন তা বর্তমানে করা হয় না। অর্থ বিনিয়োগের বিচারে আমাদের আরও অগ্রাধিকার রয়েছে যেমন- কৃষি খাদ্য, বিদ্যুৎ জ্বালানী, সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে অনেক বেশী বরাদ্দ করার কারণে শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া সত্বেও অর্থ বিনিয়োগ যথেষ্ঠ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু শিক্ষায় বিনিয়োগ হচ্ছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ।

শিক্ষা বিষয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফোরাম EFA (Education For All) -২০ বছর পূর্বে সকল দেশের সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান, জাতি সংঘ, ইউনেস্কোসহ প্রায় সকল আন্তর্জাতিক ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রথম সম্মেলনে এবং পরবর্তী সকল সম্মেলনে এবং এ বছর আবার একই স্থানে ('জমতিয়ান সম্মেলন' ও 'জমতিয়ান ঘোষণা' হিসেবে পরিচিতি) অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সম্মেলনে আমাদের মত দেশগুলোর জন্য সর্বশেষ সম্মেলনে কমিয়েও নিজ নিজ দেশের জিডিপি'র শতকরা ৬ ভাগ অথবা কমপক্ষে জাতীয় বাজেটের ২০% শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে হবে। কিন্তু আমরা বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ করি জিডিপির ২.৩% অর্থাৎ জাতীয় বাজেটের প্রায় ১২ %। এ অর্থ আবার ৩টি মন্ত্রণালয়ে ভাগ করে দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

বর্তমানে দুনিয়ায় শিক্ষা খাতে এত কম বিনিয়োগ করে এমন উদাহরণ নেই। প্রায় সকল দেশ ২০% বা তার বেশী শিক্ষা খাতে ব্যয় করে। এমনকি আফ্রিকায় সাধারণভাবে প্রায় সকল দেশে শিক্ষায় জিডিপি'র ৫% এর বেশী ব্যয় করে। কেনিয়া জাতীয় বাজেটের ৩১% এবং সেনেগাল ৪০% শিক্ষায় ব্যয় করে। আমাদের দেশে আর দেরী না করে শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিতে হবে। জাতীয় বাজেটের ২০% যথা সম্ভব দ্রুত শিক্ষায় বিনিয়োগ করা উচিত। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য বাড়তি অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে ও নির্দেশনায় একটি শিক্ষা ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা দেওয়ার জন্য।

শিক্ষা খাতে সরকারি বিনিয়োগ ছাড়াও বেসরকারি বিনিয়োগের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষায় ব্যবসা ও মুনাফার স্থান দেয়া যাবে না। জন কল্যাণে শিক্ষায় বেসরকারি উদ্যোগ ও সাহায্য দরকার।

এ রকম বহু ধরনের সীমাবদ্ধতা, সমস্যা, বাধার মধ্যে আমাদের এগুতে হচ্ছে। তা সত্বেও বিগত আড়াই বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এতে আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট নই। অনেক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও বাধা অতিক্রম করে আমাদের আরও অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করতে হবে। আমরা আশাবাদী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি অব্যাহত রাখবে এবং আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। আমরা সকলের সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থী।

মাতৃভাষা বাংলাসহ বিশ্বের সকল দেশ ও জাতির মাতৃভাষা চর্চা গবেষণা, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে স্থাপন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। ২০১০ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর উদ্বোধন করেছেন। ইনস্টিটিউটের প্রথম পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শেষ হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প কাজ চলছে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন ২০১০ জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে।

স্মরণকালের মধ্যে ২০১১ সালের এস এস সি পরীক্ষায় পাশের হার ছিল সর্বোচ্চ। পাশের হার ৮২.৩১%।
দেশের সবচেয়ে ভাল একটি কলেজের সাফল্যে আনন্দে উদ্বেলিত শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ। www.moedu.gov.bd